Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-II, January 2024, Page No.91-97
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

বিংশ শতকের নির্বাচিত বাংলা চলচ্চিত্রে চৈতন্যজীবনের প্রতিগ্রহণ

সুপর্ণা মণ্ডল

পিএইচডি গবেষক, তুলনামূলক সাহিত্য কেন্দ্র, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

The birth of Chaitanya in the year 1486 is a crucial event in Bengali social, cultural, and literary sphere. If we discuss about literature particularly, the advent of Chaitanya brought new life to Bengali literature. Not only Vaishnava Padavali, the life of Chaitanya inspired Bengali poets to write hagiographies based on his life as well. By twentieth century, the effect of Chaitanya surely declined but the sense of devotion and emotion for Chaitanya was still present in the hearts of Bengali people. We can find relevant proofs in the depiction of the life of Chaitanya in the then newly arrived medium of the films. The first phase of Indian Cinema saw an abundance of Puranic stories. We can identify the films based on Chaitanya's life in this category as they represent Puranic devotion along with historical contextualization. We can find films like Shrigouranga (1933), Shachidulal (1934), Nimai Sanyas (1940), Bishnupriya (1949), Bhagaban Shrikrishnachaitanya (1953), Nilachale Mahaprabhu (1957), Nader Nimai (1960), Nimai Sanyasi (1972), Nadia Nagar (1986) etc. This paper has tried to discuss selected films based on Chaitanya's life in context with the Bengali hagiographies written earlier.

Keywords: Life of Chaitanya, Hagiography, Bengali Cinema, Indian Cinema, Popular History, Reception Studies.

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে চৈতন্যের আবির্ভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ঘটনা যা বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি, সাহিত্য সমস্ত ক্ষেত্রেই ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিশেষত সাহিত্যের কথাই যদি বলি, তাহলে দেখা যায় চৈতন্যের আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের মরা গাঙে যেন নতুন জোয়ার নিয়ে এল। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে নতুনতর সংযোজনের পাশাপাশি চৈতন্যজীবন বাংলা সাহিত্যের একটি নতুন সংরূপকেও প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করল, তা হল জীবনীসাহিত্য। তবে এই সমস্ত জীবনীসাহিত্যে চৈতন্যকে নিছক একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে দেখা হয়নি। ইংরাজিতে যাকে বলা হয় 'Hagiography' বা সন্তজীবনী তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী চৈতন্যকে কেন্দ্র করে প্রচারিত অলৌকিক ঘটনাবলীকেও স্থান দেওয়া হয়েছে এই জীবনীগ্রন্থগুলিতে। বিংশ শতকের প্রেক্ষিতে চৈতন্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব অনেকটা স্তিমিত হয়ে এলেও বাঙালির চিরকালীন ভক্তিসঞ্জাত আবেগের জায়গা থেকে চৈতন্যের আবেদন বাঙালিমানস থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। তার প্রমাণ আমরা পাই চলচ্চিত্রের মতো নতুন একটি শিল্পমাধ্যমে চৈতন্যজীবনের বিবিধ চিত্রণের মধ্য দিয়ে। ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রথম দিকে পৌরাণিক কাহিনিনির্ভর চলচ্চিত্র নির্মাণের একটি প্রবণতা লক্ষ করা

গিয়েছিল। চৈতন্যের জীবনভিত্তিক চলচ্চিত্রগুলিকে আমরা সেই ধারার মধ্যেই চিহ্নিত করতে পারি যা একাধারে পৌরাণিক ভক্তিরসের সঙ্গে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকেও মিলিয়ে দিয়েছিল। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা চৈতন্যজীবন ও জীবনীসাহিত্যের প্রেক্ষিতে নির্বাচিত চৈতন্যজীবননির্ভর বাংলা চলচ্চিত্রগুলির স্বরূপ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব।

চৈতন্যজীবননির্ভর বাংলা চলচ্চিত্রের ধারায় প্রথমেই পাওয়া যায় প্রফুল্ল ঘোষ পরিচালিত *শ্রীগৌরাঙ্গ* (১৯৩৩) চলচ্চিত্রটিকে। তারপর একে একে পাই প্রফুল্ল রায় পরিচালিত *শচীদুলাল* (১৯৩৪), ফণি বর্মা পরিচালিত *নিমাই সন্ন্যাসী* (১৯৪০), হেমচন্দ্র চন্দ্র পরিচালিত *বিষ্ণুপ্রিয়া* (১৯৪৯), দেবকী বসু পরিচালিত *ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য* (১৯৫৩), কার্তিক চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত *নীলাচলে মহাপ্রভু* (১৯৫৭), বিমল রায় পরিচালিত *নদের নিমাই* (১৯৬০), ভূপেন রায় পরিচালিত *শচীমার সংসার* (১৯৭১), সিরাজুল ইসলাম ভূইয়া পরিচালিত *নিমাই সন্ন্যাসী* (১৯৭২), সুশীল মুখার্জি পরিচালিত *নদীয়া নাগর* (১৯৮৬) প্রভৃতি চলচ্চিত্রগুলি। সামগ্রিক ভাবে চৈতন্যের জীবনীসাহিত্য, জনশ্রুতি এবং কোথাও কোথাও চলচ্চিত্র নির্মাতাগণের নিজস্ব কল্পনার রঙে চৈতন্যজীবন চিত্রিত হয়েছে এই সমস্ত চলচ্চিত্রে। আলোচনার সুবিধার্থে এর মধ্যে থেকে তিনটি চলচ্চিত্রের উপর আলোচনাকে কেন্দ্রীভূত করা হবে। কালানুক্রমিক ভাবে এই তিনটি চলচ্চিত্র হল *ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য* (১৯৫৩), *নীলাচলে মহাপ্রভু* (১৯৫৭) এবং *নিমাই সন্ন্যাসী* (১৯৭২)।

দেবকী বসু পরিচালিত *ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য* (১৯৫৩) চলচ্চিত্রের শুরুতেই চলচ্চিত্রোপযোগী একটি দৃশ্য নির্মাণ করে তৎকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটকে খুব সংক্ষেপের মধ্যে চিত্রিত করেছেন পরিচালক। এখানে আমরা একদিকে দেখি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পূজার শোভাযাত্রা, অন্যদিকে গৌড়ের নটী মেনকার তাঞ্জাম, মাঝখান থেকে সমাজের তথাকথিত 'অস্পৃশ্য' কিছু মানুষ সচেতন ভাবে সরে দাঁড়ায় ব্রাহ্মণদের পথ থেকে যাতে তাদের ছোঁয়া না লাগে উচ্চবর্ণীয়দের গায়ে। এই 'অস্পৃশ্য' গোষ্ঠির মধ্যেই দুটি চরিত্রকে আমরা পাই- এক অন্ধ ব্যক্তি ও তার বালক পুত্র বেণু। বাবার অন্ধত্ব সারানোর উদ্দেশ্যে পুজোর ফোঁটা আনতে গিয়ে গরম যজ্ঞপাত্রে হাত দিয়ে হাত পুড়িয়ে ফেলে বেণু। কিন্তু তাতে ব্রাহ্মণদের কোন সহানুভূতি জন্মায় না। তাদের সর্বপ্রথম জিজ্ঞাস্য বেণুর জাত। একই ভাবে ব্রাহ্মণদের হাতে কোণঠাসা হয় নটী মেনকা। কিন্তু বৈষ্ণব আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে একটা সামাজিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপট যে রচিত হচ্ছিল তা স্পষ্ট হয়ে যায় বেণুর ঘটনা ও নটীর মন্দিরে যাওয়ার বাসনার উল্লেখে। সমাজের অপাঙ্‌ক্তেয় মানুষেরা যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সাহস পেয়েছিল তা সম্ভব হত না বৈষ্ণব প্রভাব ছাড়া। তবে চৈতন্যজীবনী সাহিত্যের মতো চৈতন্যের জন্ম ও শৈশবের কাহিনি বলা হয়নি এই চলচ্চিত্রে। একেবারে নিমাই পণ্ডিতরূপে দিগ্বিজয়ী বিজয়ের পরবর্তী থেকে চৈতন্যের জীবন প্রদর্শিত হয়েছে। অল্প পরিসরের মধ্যেই দেখানো হয়েছে অদ্বৈতাচার্যের কৃষ্ণরূপী চৈতন্যকে আবাহন করার দৃশ্য। *চৈতন্য পরিকর* গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ মাইতি জানিয়েছেন, অদ্বৈত হরিনাম প্রচারের উদ্দেশ্যে নবদ্বীপে টোল খুলে বসেন ও শ্রীবাসের গৃহে বিশেষরূপে অধিষ্ঠান করেন (৩৭)। আলোচ্য চলচ্চিত্রে দেবকী বসু অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, শ্রীবাস প্রভৃতি চৈতন্য পরিকরদের মুখ্য ভূমিকায় রেখে চৈতন্যের অবতারত্ব প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট রচনা করেছেন। তবে নিমাই পণ্ডিত থেকে চৈতন্য হয়ে ওঠার যে যাত্রা তা এখানে খুব বেশি পরিস্ফুট হয়নি। নিমাইয়ের পাণ্ডিত্যের কথা মৌখিক ভাবে উল্লিখিত হলেও গয়াগমনের আগেই তার মধ্যে বৈষ্ণবীয় ভক্তির রূপ দেখা যায় যদিও বাহ্যিক ভাবে সে বৈষ্ণব গোষ্ঠির সঙ্গে মিলিত হয়নি তখনও। চলচ্চিত্রে কাহিনিটি এভাবে দেখানো হলেও

চৈতন্য-ভাগবতে বলা হয়েছিল যে নিমাই পণ্ডিতের কৈশোর কালেই তাঁর সঙ্গে ঈশ্বর পুরীর সাক্ষাৎ এবং কৃষ্ণকথা বিষয়ক আলাপ হয়। পরে গয়াধামে তিনি দশাক্ষর গোপালমন্ত্রে দীক্ষা দেন তাকে।

চলচ্চিত্রে নাটকীয়তা সৃষ্টির জন্য নায়কের বিপরীতে প্রতিনায়ক দেখানো হয়। দেবকী বসু আলোচ্য চলচ্চিত্রে নবদ্বীপের গোঁড়া ব্রাহ্মণ সমাজ ও তার মধ্যে বিশেষ করে জগন্নাথ ও মাধব অর্থাৎ জগাই-মাধাইকে চৈতন্য গোষ্ঠির প্রতিপক্ষ হিসাবে দেখিয়েছেন। জগাই-মাধাই উদ্ধারের কাহিনি চৈতন্যজীবনী গ্রন্থগুলিতেও পাওয়া যায়। শ্রীবাস অঙ্গনে গৌরাঙ্গের নৃত্যগীতের সময় শ্রীবাসের শিশুপুত্রের মৃত্যুর ঘটনা এবং গৌরাঙ্গের আনন্দে ব্যাঘাত না ঘটাতে চাওয়ায় শ্রীবাসকর্তৃক এই খবর গোপন করার বিষয়টি চৈতন্যভাগবতের অনুসারেই রয়েছে। মৃত শিশুকে দিয়ে কথা বলানোর মধ্য দিয়ে চৈতন্যের অলৌকিক মহিমা এখানে প্রকাশিত হয়েছে। আবার মৃত বেণুর চৈতন্যের চরণধূলিতে বেঁচে ওঠার দৃশ্যের মধ্য দিয়েও চৈতন্যের ঐশ্বরিক ক্ষমতার প্রদর্শন করা হয়েছে। সন্তজীবনীতে এই ধরনের অতিলৌকিক ঘটনার সন্নিবেশ প্রায়শই দেখা যায়।

এছাড়া আলোচ্য ছায়াছবিতে বিষ্ণুপ্রিয়ার ভূমিকায় সুচিত্রা সেনের উজ্জ্বল উপস্থিতি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। চৈতন্যভাগবতে একবার মাত্র বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম করা হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁর উপর দেবত্ব আরোপ করে তাঁকে লক্ষ্মীর অংশরূপে কল্পনা করা হয়। বিমানবিহারী মজুমদারের মতে, গ্রন্থ রচনার সময় তিনি হয়তো জীবিত ছিলেন তাই তাঁর সম্ভ্রম রক্ষার জন্য কবি বৃন্দাবনদাস তাঁর নাম করেননি (*শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান* ১৯৪)। চলচ্চিত্রে বিষ্ণুপ্রিয়ার মানবিক রূপই আমরা দেখতে পাই। যদিও গৌরাঙ্গকে তিনি দেবতার আসনে বসিয়েছিলেন, তা সত্ত্বেও তাঁকে সন্ন্যাসে যেতে দিতে প্রাথমিক ভাবে রাজি হননি তিনি। গৌরাঙ্গ তাঁর দৈবস্বরূপ প্রকট করে শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়া উভয়ের সম্মতি আদায় করেন। শচীমাতার কাছ থেকে সম্মতি আদায়ের প্রসঙ্গ চৈতন্য ভাগবতে থাকলেও বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রসঙ্গ খুব বেশি পাওয়া যায় না। চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের মধ্য দিয়েই *ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য*-এর কাহিনি সমাপ্ত করা হয়েছে।

১৯৫৭ সালে মুক্তি পায় কার্তিক চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত আরেকটি চৈতন্যজীবনীনির্ভর চলচ্চিত্র *নীলাচলে মহাপ্রভু*। এখানে মূলত নীলাচলকে কেন্দ্র করে চৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পরবর্তী জীবন বর্ণিত হয়েছে। ওড়িষার তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। পূর্বালোচিত চলচ্চিত্রে দেবকী বসু যেমন নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ সমাজের গোঁড়ামি ও অস্পৃশ্যতার সমস্যাকে প্রেক্ষাপট হিসাবে তুলে ধরেছেন, এখানেও তেমনি ওড়িষার নুলিয়া সমাজের দুর্দশার কথা পরিস্ফুট হয়েছে। রাজা প্রতাপরুদ্রের অনুপস্থিতিতে মন্ত্রী বিদ্যাধরের চক্রান্ত চলচ্চিত্রের অনেকটা জায়গা জুড়ে রয়েছে। পুরীতে চৈতন্যের প্রথম জগন্নাথ দর্শন করে মূর্ছা যাওয়ার যে ঘটনা এখানে দৃশ্যায়িত করা হয়েছে তা চৈতন্যভাগবত এবং চৈতন্যচরিতামৃতের অনুসারী। বৃন্দাবনদাসের মতে নীলাচলে এসে প্রথমেই চৈতন্যদেব জগন্নাথ দর্শনে চলে যান এবং সেখানে মূর্ছিত হয়ে গেলে মন্দিরের সেবকেরা তাঁরে প্রহার করতে উদ্যত হয়। সার্বভৌম ভট্টাচার্য তাঁকে সেখান থেকে উদ্ধার করে নিজ বাসগৃহে নিয়ে যান। চৈতন্যদেবের বাকি সঙ্গীসাথীরা পরে সেখানেই মিলিত হয়। সার্বভৌমের গৃহেই তাঁরা থাকতে শুরু করেন। সার্বভৌম উদ্ধারের যে কাহিনি চরিতসাহিত্যগুলিতে বর্ণিত হয়েছে তার মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। বৃন্দাবনদাস তাঁর কাব্যে এক দিনের মধ্যেই এই কার্য সমাপ্ত করেছেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই ঘটনাকে প্রায় বারো দিনব্যাপি দেখিয়েছেন। বিমানবিহারী মজুমদারের মতে,

> একজন সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতের মত পরিবর্ত্তন করার পক্ষে একদিনের ঘটনা যথেষ্ট নহে। সার্ব্বভৌম-উদ্ধারের সময় নিত্যানন্দ প্রভু কাছে বসিয়া ছিলেন না; সুতরাং এ বিষয়ে বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা সত্য বলিয়া স্বীকার করার প্রয়োজন নাই। (*শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান* ৩৪৫)

নীলাচলে মহাপ্রভু-র পরিচালক এখানে মোটামুটি ভাবে চরিতামৃতের অনুসরণই করেছেন। নৈয়ায়িক সার্বভৌমের কাছে চৈতন্যের ভাবোন্মাদ দশাকে শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং সন্ন্যাসীর পক্ষে অনুচিত আচরণ বলে প্রতিভাত হয়। তিনি বেদান্তের পাঠ দিতে চান চৈতন্যকে। বেদান্তের পাঠপ্রদানের দৃশ্যে কৃষ্ণদাস উল্লিখিত 'আত্মারামশ্চ মুনয়ো' শ্লোকের কথাও উঠে এসেছে। চরিতামৃতকার দেখিয়েছেন সার্বভৌম পরাজয় স্বীকার করলে মহাপ্রভু কৃপা করে তাঁকে নিজের স্বরূপ দেখান:

> দেখাইল তাঁরে আগে চতুর্ভুজ রূপ।
> পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ।।

আলোচ্য ছায়াছবিতে চতুর্ভুজ মূর্তির পরিবর্তে দ্বিভুজ রামের মূর্তিই প্রদর্শন করা হয়েছে। তবে সার্বভৌমের দ্বারা শত শ্লোকে তাঁর স্তব করার প্রসঙ্গটি এখানে বর্জিত হয়েছে। অশুচি অবস্থায় জগন্নাথের প্রসাদ গ্রহণের বৃত্তান্তটি চরিতকাব্য অনুসারে পাওয়া যায়। তাছাড়া মহাপ্রভুর গোষ্ঠির সঙ্গে হরিনামে নৃত্যগীত করতেও দেখা যায় সার্বভৌমকে।

সার্বভৌম উদ্ধারের পর চৈতন্যের দক্ষিণাপথ ভ্রমণের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় চলচ্চিত্রে। কিন্তু এই ভ্রমণের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়নি। শুধুমাত্র রায় রামানন্দ নীলাচলে এসে রাজা প্রতাপরুদ্রের কাছে চৈতন্যের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের বিবরণ দিয়েছেন এবং রাজকার্য থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন। চলচ্চিত্রের শুরুর দিকে রাজা প্রতাপরুদ্রের অনুপস্থিতিতে মন্ত্রী বিদ্যাধরকে নানাবিধ ষড়যন্ত্র করতে দেখা যায়। চৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখন্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে বৃন্দাবনদাস উল্লেখ করেছিলেন যে চৈতন্য যখন নীলাচলে আসেন তখন রাজা প্রতাপরুদ্র বিজয়নগরে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। এই তথ্যের ঐতিহাসিক সমর্থণও পাওয়া যায়। বিদ্যাধরের চক্রান্তের বিষয়টি চৈতন্যজীবনীগ্রন্থে বিস্তারিত নেই। মাদলা পঞ্জিতে তাঁর নাম পাওয়া যায়। তবে খল চরিত্র হিসাবে এই চলচ্চিত্রে তাঁর অবস্থান বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রতাপরুদ্র যুদ্ধ থেকে ফিরে গৌড়ের সন্ন্যাসীর বিষয়ে জানতে পারলে তাঁকে দেখার জন্য আগ্রহী হয়ে ওঠেন। কিন্তু তখন চৈতন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণে চলে গেছেন। চৈতন্যের প্রতি প্রতাপরুদ্রের মনোভাব প্রাথমিক ভাবে প্রতিকূল রূপেই দেখানো হয়। বৃন্দাবনদাস তাঁর কাব্যে অল্প পরিসরের মধ্যেই প্রতাপরুদ্র উদ্ধারের কাহিনি বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে, সন্ন্যাসীর রাজদর্শন নিষিদ্ধ থাকায় প্রথমে রাজা গোপনে দূর থেকে তাঁর দর্শন করেন। ভাবোন্মত্ত চৈতন্যের বাহ্যজ্ঞানশূন্য অশুচি অবস্থা দেখে প্রাথমিক ভাবে রাজার মনে সংশয় জন্মায় কিন্তু স্বপ্নে জগন্নাথরূপে চৈতন্য দেখা দিলে তাঁর সংশয় দূর হয় এবং তিনি চৈতন্যের চরণে আত্মসমর্পণ করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রতাপরুদ্র মিলনের ঘটনাটি আরো বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। এখানে দেখা যায় রাজার আদেশেই সার্বভৌম কাশীমিশ্রের গৃহে চৈতন্যের থাকার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু রাজদর্শনে একেবারেই রাজি হননি চৈতন্য। পরে সার্বভৌমের বুদ্ধিতে রথযাত্রার দিন উদ্যানে সাধারণ পোশাক পরে কৃষ্ণরাস-পঞ্চাধ্যায়ী শুনিয়ে তিনি চৈতন্যের কৃপাভাজন হন। *নীলাচলে মহাপ্রভু* চলচ্চিত্রে পরিচালক সম্ভবত ঘটনাটি আরো নাটকীয় করার জন্য রাজা প্রতাপরুদ্রকে প্রাথমিক ভাবে চৈতন্যবিরোধী হিসাবে দেখিয়েছেন, যদিও বিরোধিতার আড়ালে রাজার

চৈতন্যপ্রেমই বেশি করে চোখে পড়ে। রথযাত্রার দিন রথের চাকা থেমে গেলে চৈতন্যের নির্দেশে সমাজের অস্পৃশ্য গোষ্ঠির মানুষেরা যখন রথের রশিতে হাত লাগায়, তখন রথ চলতে শুরু করে। চৈতন্যের এই লীলা দেখে রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্যের চরণে আত্মনিবেদন করেন।

চৈতন্যের শচীমাতার সঙ্গে পুনর্মিলন, শেষ পর্যায়ে চৈতন্যের দিব্যোন্মাদ দশা এবং লীলা সংবরণের প্রসঙ্গও চলচ্চিত্রে পাওয়া যায়। চৈতন্যের মৃত্যুর কারণ নিয়ে বিভিন্ন জীবনীগ্রন্থের মধ্যে মতান্তর রয়েছে। চলচ্চিত্রকার তাই বিতর্কের পথে না গিয়ে শেষ দৃশ্যে সমুদ্রের দিকে চৈতন্যের গমন দেখিয়ে সমাপ্ত করেছেন।

আলোচিত দুটি চলচ্চিত্রে চৈতন্য জীবনীগ্রন্থের সঙ্গে একরকম সাদৃশ্য পাওয়া যায় কিন্তু এবার যে চলচ্চিত্রটির কথা আলোচনা করা হবে সেটি এই প্রচলিত ধারার থেকে একেবারেই অন্যরকম। সেটি হল সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশ থেকে নির্মিত, সিরাজুল ইসলাম ভূইয়া পরিচালিত *নিমাই সন্ন্যাসী* (১৯৭২)। ১৯৪৭-এর দেশভাগের পরে ঢাকা থেকে স্বতন্ত্র ভাবে চলচ্চিত্র নির্মাণের যাত্রা শুরু হয়। তবে বাংলা চলচ্চিত্রনির্মাতাদের সে সময় বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। উর্দুভাষী শাসকেরা বাংলা ভাষায় চলচ্চিত্র নির্মাণকে খুব একটা প্রশ্রয় দেয়নি। ফলে পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণের পথ খুব একটা সুগম ছিল না। *নিমাই সন্ন্যাসী* চলচ্চিত্রটি মূলত মূলধারার জনপ্রিয় কাহিনিচিত্রের ধাঁচেই নির্মিত হয়েছে। নিমাইয়ের শৈশব থেকেই চলচ্চিত্রের কাহিনি শুরু এবং শৈশবের ঘটনাকেই অনেকটা পরিসর জুড়ে রাখা হয়েছে। মজার কথা, এখানে নিমাই ও নিতাইকে দুই ভাই হিসাবে দেখানো হয়েছে যদিও আমরা জানি যে তাঁরা দুজন সহোদর ভাই ছিলেন না। নিমাইয়ের দুরন্তপনার পাশাপাশি এখানে বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর বাল্যপ্রেম বিভিন্ন ভাবে দেখানো হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই বাল্যপ্রণয়ের কথা কোন জীবনীসাহিত্যে পাওয়া যায় না। বরং লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে বিবাহের পূর্বে নিমাইয়ের সাক্ষাতের বিবরণ তাও পাওয়া যায়। লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর প্রসঙ্গ চলচ্চিত্রে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। চলচ্চিত্রকার এখানে জীবনীসাহিত্যগুলি ততটা অনুসরণ করেননি যতটা করেছেন জনপ্রিয়তার ব্যাকরণকে। মূলধারার ছায়াছবিতে যেমন দেখা যায় নায়ক নায়িকা ছুটতে ছুটতে বাল্যাবস্থা থেকে যৌবনে পদার্পণ করছে, এখানেও সেইরকম দৃশ্য দেখানো হয়েছে। এই নিমাই যেন অবতার নয়, খুব সাধারণ একজন মানুষ। এছাড়া এখানে সাধুবেশী এক চরিত্রকেও দেখা যায় যিনি মাঝে মাঝে নিমাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার মনে বৈরাগ্যভাব জাগিয়ে তোলেন। নিমাইয়ের পিতাকে এখানে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে যদিও জীবনীসাহিত্যে আমরা তাঁর দাদা বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের কথাই পাই।

যাই হোক, সাধুর সঙ্গে বৈরাগ্য বিষয়ক কথোপকথন মূলত মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের মতো মনে হয় যা কৃষ্ণভক্ত চৈতন্য ঘৃণা করতেন বলেই আমরা জানি। মায়াবাদী হওয়ার জন্য তিনি সার্বভৌম ভট্টাচার্যকেও তিরস্কার করেছিলেন। কিন্তু এই চলচ্চিত্রে নিমাইয়ের কৃষ্ণভক্তির কোন নিদর্শন দেখানো হয়নি। শুধু একটি দৃশ্যে নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে পাশাপাশি বসে থাকতে দেখে বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা তাঁদের রাধাকৃষ্ণরূপে দেখেন। জগাই মাধাই চরিত্রদুটিকেও এখানে সম্পূর্ণ অন্য প্রেক্ষাপটে দেখানো হয়েছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে নিমাইয়ের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে তাদের অসূয়া। তাদের বিবাহ ঠিক হলে জগাই-মাধাই নিমাইয়ের মাথায় পাথর ছুড়ে মারে। রক্তাক্ত নিমাইয়ের মধ্যে তারপর তারা কৃষ্ণের স্বরূপ দেখতে পায়। চৈতন্যভাগবতে জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করতে গিয়ে নিত্যানন্দ মাধাইয়ের দ্বারা আহত হন কিছুটা একইভাবে। কিন্তু এখানে সেই প্রেক্ষাপটকে

সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা হয়েছে। *নিমাই সন্ন্যাসী* চলচ্চিত্রে আরো দেখি যে নিমাইয়ের বৈরাগ্য ভাব প্রবল হয়ে উঠলে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করতে আপত্তি জানান তিনি। কিন্তু গুরুজনদের আদেশে শেষ অব্দি বিবাহ করতে হয় তাঁকে। যদিও নাটকীয় ভাবে বাসরঘর থেকেই রাত্রিবেলা উঠে চলে যান তিনি। তারপর আবারও নাটকীয় ভাবে শচীমা ও বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁকে খুঁজে বেড়ান। তবে শেষ অব্দি নিমাইকে ধরে রাখা যায় না। কীর্তন গাইতে গাইতে সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে যান তিনি। সুতরাং বলা যায়, সিরাজুল ইসলাম ভূইয়া পরিচালিত *নিমাই সন্ন্যাসী* চলচ্চিত্রে আমরা যে নিমাইকে দেখি সে ঠিক ঐতিহাসিক ভাবে নির্ভুল চরিত্র নয়। আমরা জানি, পাকিস্তানি আমলে উর্দু চলচ্চিত্রের বিপরীতে দাঁড়িয়ে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে বাংলা চলচ্চিত্র নির্মাণের ক্ষেত্রে পূর্ববঙ্গের গাথা-গীতিকার কাহিনিগুলি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। *নিমাই সন্ন্যাসী*-র ক্ষেত্রেও এই প্রভাব দুর্লক্ষ্য নয়। তবে শুধু গাথা বা গীতিকা নয়; যাত্রা, কীর্তন, বিভিন্ন ধরনের লোকনাট্য- সব মিলিয়ে পূর্ববঙ্গের জনপ্রিয় কল্পনায় চৈতন্যের যে অবয়ব তৈরি হয়েছিল, তারই একটা বিশেষ উপস্থাপনা দেখা যায় এই চলচ্চিত্রে। এই নিমাই অন্য এক নিমাই, নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিত নয়। জনপ্রিয় কল্পনার এই নিমাই স্মরণীয় হয়ে আছেন সন্ন্যাস গ্রহণ করে সংসার ত্যাগ করার জন্য। কৃষ্ণের অবতার বা কৃষ্ণভক্তির প্রচারক হিসাবে চৈতন্যের যে ধর্মীয় পরিচয় ছিল তা এখানে খুব একটা গুরুত্ব পায়নি। গুরুত্ব পেয়েছে মানুষ নিমাই ও তার মানবিক সম্পর্কের দিকগুলি। চৈতন্যজীবনের এই বিকল্প প্রতিগ্রহণ আমরা এখানে দেখতে পাই যে কারণে এই চলচ্চিত্রটির গুরুত্ব কম নয়।

রূপালি পর্দায় চৈতন্যজীবনের উপস্থাপন কীভাবে হয়ে এসেছে তা ভারত এবং বাংলাদেশ দুই দেশের চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রেই পর্যবেক্ষণ করা হল। জীবনীসাহিত্যের ক্ষেত্রে যদি সত্যতার প্রশ্নটিকেই তোলা হয়, তাহলে অমিয় পি. সেনের মন্তব্যটি এখানে উল্লেখ করতে হয়:

> Most hagiographies on Chaitanya are lamentably inaccurate, inconsistent, and careless with historical and biographical details… (Sen 29)

শুধু সন্তজীবনীই নয়, ভারতীয় প্রেক্ষাপটে ইতিহাসচর্চার ইতিহাসও যদি দেখা যায় তাহলে এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এখানে তথ্য ও কল্পনার মধ্যে খুব একটা সরলরৈখিক বিভাজন করা হয়নি সব সময়। ভারতীয় মনন হয়তো তথ্যগত সত্যের ঊর্ধ্বে কোন বৃহত্তর জীবনসত্যের প্রতি নিবিষ্ট ছিল। চৈতন্যজীবনীসাহিত্য রচয়িতারাও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। বৃন্দাবনদাস নিজেও একথা স্বীকার করেছিলেন যে চৈতন্যের জীবনে কোন ক্রম অনুযায়ী কোন ঘটনা ঘটেছে তা তিনি সঠিক ভাবে অনুসরণ করতে পারেননি। আলোচ্য চলচ্চিত্রগুলি যেহেতু কাহিনিচিত্র, তথ্যচিত্র নয়, ফলে সামগ্রিক ভাবে তথ্যগত সত্যতা তাদের থেকেও আশা করা যায় না। কিন্তু 'জনপ্রিয় ইতিহাস'-এর পর্যায় থেকে দেখলে তাদের গুরুত্ব একেবারে অস্বীকার করাও যায় না। দেবকী বসু, কার্তিক চট্টোপাধ্যায় এবং সিরাজুল ইসলাম ভূইয়ার নির্মিত চৈতন্যজীবননির্ভর বাংলা চলচ্চিত্রগুলি জনপ্রিয় কল্পনায় এবং বাংলা চলচ্চিত্রের পরিবর্তনশীল শৈলীতে চৈতন্যের প্রতিগ্রহণকে বোঝার জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

তথ্যসূত্র:

1) কাবাসী, শ্রীরাধানাথ, সম্পাদক। শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত। শ্রীশ্রী মদনমোহন মন্দির, ধান্যকুড়িয়া, ১৩৪৪।
2) ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। পরিচালনা দেবকী বসু, চিত্র-মায়া/ দেবকী বসু প্রোডাকশনস্, ১৯৫৩।
3) নিমাই সন্ন্যাসী। পরিচালনা সিরাজুল ইসলাম ভূইয়া, আমরা কতিপয়, ১৯৭২।
4) নীলাচলে মহাপ্রভু। পরিচালনা কার্তিক চট্টোপাধ্যায়, উদয় চিত্র প্রতিষ্ঠান/ মোহন মজুমদার, ১৯৫৭।
5) মজুমদার, বিমানবিহারী। শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৯।
6) মজুমদার, শ্রীসুবোধচন্দ্র, সম্পাদক। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। পি. সি. মজুমদার এণ্ড ব্রাদার্স, ১৯৪১।
7) মাইতি, শ্রীরবীন্দ্রনাথ। চৈতন্য-পরিকর: ষোড়শ শতক। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬২।
8) সেন, কুমুদবন্ধু। "উড়িষ্যায় শ্রীচৈতন্য"। প্রবাসী, পঞ্চত্রিংশ ভাগ, প্রথম খন্ড, বৈশাখ ১৩৪২। পৃ. ৪৯।
9) হায়াৎ, অনুপম। পুরানো ঢাকায় চলচ্চিত্র। ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ, ২০০৯।
10) Bhatia, Varuni. Unforgetting Chaitanya: Vaishnavism and Cultures of Devotion in Colonial Bengal. Oxford University Press, 2017.
11) Sen, Amiya P. Chaitanya: A Life and Legacy. Oxford University Press, 2019.